চিন্তাপরাধ

আসিফ আদনান

Ilmhouse

সূচীপত্রে

পূর্বকথা / ৮
সহস্র সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল / ১২
ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক / ২৫
চিন্তার জট / ৩৭
পূজারি ও পূজিত / ৪৫
গোড়ায় গলদ / ৫৯
শুভঙ্করের ফাঁকি / ৬৭
স্থিতিস্থাপকতা, না-মানুষ ও অন্যান্য / ৭৮
ভুল মাপকাঠি / ৮৯
সমকামী এজেন্ডা : ব্লু-প্রিন্ট / ৯৬
মরীচিকা / ১১১
বালির বাঁধ / ১১৯
মানসিক দাসত্ব / ১৩৩
হাউস নিগার / ১৩৮
সাম্রাজ্যের সমাপ্তি / ১৪৪
অবক্ষয়কাল / ১৫১
শ্বেত সন্ত্রাস / ১৬০

সহস্র সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল

১.

অগাস্টের ৬ তারিখ।

দিনটা শুরু হয়েছিল গ্রীষ্মের অন্য দশটা স্বচ্ছ, উজ্জ্বল দিনের মতোই। সকাল সাতটার দিকে বেজে ওঠা পাগলাঘন্টির শব্দ ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া শহরবাসীর কাছে খুব একটা গুরুত্ব পেল না। আরও কম গুরুত্ব পেল এক ঘণ্টা পর বেজে ওঠা বিপদ কেটে যাওয়ার সংকেত। কর্মব্যস্ত দিনের প্রস্তুতি নিতে থাকা শহরটার বাসিন্দাদের কাছে হয়তো অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় সময় কাটানো বিলাসিতা মনে হয়েছিল।

ঠিক পনেরো মিনিট পর, সকাল ৮.১৫ তে আকাশের বুকে দেখা দিলো এক নিঃশব্দ আলোর ঝলকানি। সাদার চেয়েও সাদা। তার ঠিক পরপর, এক বিকট, ভোঁতা শব্দ। সহস্র সূর্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে আকাশের বুক চিরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে গেল আগুনের সোনালি সন্ত্রাস। মুহূর্তের মধ্যে লন্ডভন্ড হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের শহরটা। স্রেফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল বিস্ফোরণস্থলের এক মাইলের মধ্যে প্রায় সবকিছু। ইট, কাঠ আর কংক্রিটের পাশাপাশি বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাত শহরের অধিবাসীদেরও প্রবল শক্তিতে ছুড়ে দিলো এদিক-সেদিক। তারপর শহরটাকে গ্রাস করল আগুনের উড়ন্ত ঝড়। বৃদ্ধ বাবার চশমা, নিশ্চিন্ত চোখে পৃথিবীকে দেখতে থাকা আধোআধো বোলের শিশু, সতর্কতার সাথে বাছাই করা খেলার সাজসরঞ্জাম আর দোলনা, দুই ঝুঁটি করা স্কুলড্রেসের ছোট্ট খুকির হাসি, ক্লাসের দুষ্ট ছেলেটার লাল ব্যাগ, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় অন্যমনস্ক যুবক, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনে পথের কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকা ভেজা চুলের তরুণী, অর্ধেক অঙ্ক কষা ব্ল্যাকবোর্ড, সদ্যখোলা অফিসের পেটমোটা ফাইল, ঘাসফুল, প্রজাপতি,

পাখি... নিমিষেই মুছে গেল সবাই, সবকিছু। আগুনের তীব্র উত্তাপে ঝলসে গেল টিকে থাকা অল্প কিছু রাস্তা, দেয়াল আর ব্রিজের রং। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের অনেকের ছায়া স্থায়ীভাবে গেঁথে গেল সেখানে। বিস্ফোরণের এক মিনিটের মধ্যে মারা গেল এক লক্ষের মতো মানুষ, আহত হলো আরও প্রায় এক লক্ষ। ধীরে ধীরে শহরটার ওপর আকাশটাকে ঢেকে দিতে শুরু করল ব্যাঙের ছাতার মতো পাক খেতে থাকা ধোঁয়া আর ধুলোর বিশাল এক মেঘ।

রাস্তা আর ফুটপাথজুড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা হাজারো মানুষ দিনভর তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো ঠায় বসে রইল, বমি করল, তারপর মারা গেল। পুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে কোনো মতে নদীর পাড় পর্যন্ত এসে সব শক্তি হারিয়ে সেখানেই নিথর শুয়ে থাকল আরও কয়েক হাজার। সন্ধ্যার দিকে বাড়তে থাকা নদীর পানিতে নীরবে, নিঃশব্দে তলিয়ে গেল অনেকে। আর নৌকায় ওঠানোর জন্য হাত ধরে টানতেই নিচের মাংস উন্মুক্ত করে সড়সড় করে গ্লাভসের মতো খুলে এল কারও কারও রক্ত-পুঁজ মাখানো চামড়া।

চুরমার হয়ে যাওয়া হিরোশিমার রক্ত-মাংসে পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে দেখা গেল জনাবিশেক সৈনিককে। শূন্য চোখের কোটরের নিচে পুড়ে যাওয়া গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওদের গলিত চোখ। সম্ভবত বিস্ফোরণের সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা।

চরম বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে ১৯৪৫ এর ৬ই অগাস্ট হিরোশিমার মাটি থেকে ১,৯০০ ফিট ওপরে ৬৪ কেজি ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল 'লিটল বয়', মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাবস্থায় ব্যবহৃত আণবিক বোমা। লিটল বয়ের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল হিরোশিমার ৭০% বিল্ডিং। অ্যামেরিকান দাবি অনুযায়ী প্রথম দিনে মৃতের সংখ্যা ৬০-৯০ হাজারের কাছাকাছি। জাপানিদের মতে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। তিন মাস পর ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী এ বোমার কারণে নিহতের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। হিরোশিমা নগর কর্তৃপক্ষ, জাপানের স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে ছাপানো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী বিস্ফোরণ-পরবর্তী দশকগুলোতে রেডিয়েইশানজনি: অসুস্থতায় মৃতদের হিসাবে ধরলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি।[১] তিন দিন পর নাগাসাকিতে ফেলা হয় দ্বিতীয় আণবিক বোমা, ফ্যাট ম্যান।

---

[১] By The Numbers: The atomic bombing of Hiroshima, Associated Press, May 27, 2016

ছয় দিন পর, ১৯৪৫ সালের ১৫ই অগাস্ট, জাপান আত্মসমর্পণ করে।

অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, অভূতপূর্ব এ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল এমন সময়ে যখন জাপান সম্মানজনক আত্মসমর্পণের পথ খুঁজছিল। ৬ অগাস্টের আগেই অ্যামেরিকান সামরিক গোয়েন্দারা জাপানের পাঠানো কোডেড মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে জাপান আত্মসমর্পণের চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ড্যার ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার, জাপানের বিরুদ্ধে চালানো সব বিমানহামলার দায়িত্ব থাকা মেইজর জেনারেল কার্টিস লি-মেই, প্যাসিফিক কম্যান্ডার ইন চীফ চেস্টার নিমিটয, প্রেসিডেন্টের চীফ অফ স্ট্যাফ উইলিয়াম লীহি, জাপানের পাঠানো গোপন বার্তা ইন্টারসেপ্ট করার পর অ্যামেরিকান সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানোর দায়িত্বে থাকা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্টার ক্লার্কসহ অনেকেই স্বীকার করেছে যে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা হামলা ছিল অপ্রয়োজনীয়।[২] তবুও সামরিকভাবে অপ্রয়োজনীয় এ হামলার সিদ্ধান্ত নেয় অ্যামেরিকা। বিশ্বমঞ্চে 'অপ্রতিরোধ্য, অজেয়, মহাশক্তিধর সুপারপাওয়ার' হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব প্রতিহত করা—আণবিক বোমা হামলার মাধ্যমে এক ঢিলে এ দুই পাখি মারার ফন্দি আঁটে অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার ভূ-রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ আর কূটনীতির বলি হতে হয় হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রায় চার লক্ষ মানুষকে।[৩]

ক্ষমতার নেশায় বেসামাল, ব্যাপক ও বিস্তৃত আধুনিক হত্যাযজ্ঞের উদ্‌গ্রীব স্থপতি অ্যামেরিকার এ হামলা শুধু গণহত্যা ছিল না, ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস—সত্যিকার অর্থে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। হিরোশিমার বিস্ফোরণের ১৬ ঘণ্টা পর অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান নিচের বক্তব্য দেয়:

> *'১৬ ঘণ্টা আগে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিরোশিমাতে একটি বোমা ফেলেছে মার্কিন বিমান। এ বোমাটি ছিল ২০,০০০ টন টি.এন.টির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, এর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বোমা হিসেবে*

---

[২] *The Decision to Use the Atomic Bomb*, Gar Alperovitz

[৩] ধারণা করা হয় নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যা ৫০,০০০-১,০০,০০০। Hiroshima and Nagasaki, Campaign For Nuclear Disarmament.
মনে রাখার ব্যাপার হলো, শুরু থেকেই মৃতদের মোট সংখ্যার ব্যাপারে অ্যামেরিকার 'ধারণা' গড়ে উঠেছে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।

স্বীকৃত 'ব্রিটিশ গ্র্যান্ড স্ল্যাম' এর চেয়ে প্রায় ২,০০০ গুণ বেশি বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন।[৪]

ট্রুম্যানের সাড়ে এগারো শ শব্দের পুরো বক্তব্য জুড়ে বারবার ফুটে ওঠা তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো।

প্রথমত, বিপুল বিধ্বংসী ভীতিকর ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করতে পারার গর্ব।

দ্বিতীয়ত, অবিশ্বাস্য মাত্রার হত্যাযজ্ঞ আর মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুশোচনার অনুপস্থিতি।

তৃতীয়ত, 'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি' নাম দিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের জ্বলজ্যান্ত একটা শহরকে সামরিক টার্গেট হিসেবে চিত্রিত করা আর বেসামরিক জনগণের পাইকারি খুনের বৈধতা তৈরি।

১৯৪৬ থেকে গত ৭৩ বছরে অ্যামেরিকা পেশাদারি দক্ষতা আর নির্লিপ্ত নৈপুণ্যের সাথে পৃথিবীজুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যা করেছে প্রায় ২ কোটি মানুষ।[৫] নিয়মিত বিরতিতে চালানো গণহত্যার পর ট্রুম্যানের মতোই একই রকম নির্বিকার আত্মবিশ্বাস আর গর্ব মেশানো আনুষ্ঠানিকতার সাথে ঠিক একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে গেছে অ্যামেরিকার অন্যান্য প্রেসিডেন্টরাও। ট্রুম্যানের পর আরও ১২ জন প্রেসিডেন্ট এলেও বদলায়নি সন্ত্রাসী হামলার পর অ্যামেরিকার দায় স্বীকারের এ মুখস্থ স্ক্রিপ্ট। ধ্বংসের প্রযুক্তির প্রতি প্রায় যৌনায়িত মুগ্ধতা, নির্বিকার অনুশোচনাহীনতা এবং নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির সন্ত্রাসকে শান্তি, মানবতা, গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো আদর্শের নামে চালিয়ে দেয়া–যুগ যুগ ধরে অ্যামেরিকান গণহত্যাকে বিশেষায়িত করে আসছে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য।

---

[৪] Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima, Public Papers Harry S. Truman 1945-1953, Harry S. Truman Presidential Library & Museum.

[৫] US Has Killed More Than 20 Million People in 37 "Victim Nations" Since World War II, James A. Lucas, January 20, 2019

২.

গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আর গুরুতর মানবিক মূল্যের বিনিময়ে নিজের স্বার্থ কেনার সাথে অ্যামেরিকার সম্পর্ক নতুন না। অ্যামেরিকা নামের এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ওই সব স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিগত নিধনের মাধ্যমে, কোনো এক বিচিত্র অধিকারবলে ইউরোপ থেকে আসা সাদা মানুষরা যাদেরকে 'রেড ইন্ডিয়ান' নাম দিয়ে, নিজেরা 'অ্যামেরিকান' খেতাব গ্রহণ করেছিল। ১৪৯২ এ ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের সময় থেকে নতুন মহাদেশে ইউরোপিয়ানরা আসতে শুরু করার পরের চার শ বছরে মারা যায় প্রায় ৮০-৯০% স্থানীয় অধিবাসী।[৬] তাদের পাইকারি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সাদা ইউরোপিয়ানদের বসবাসের 'উপযুক্ত' হয়ে ওঠে অ্যামেরিকা। লিঙ্কন, জেফারসন, জ্যাকসন, ফ্র্যাংকলিন–অ্যামেরিকান ইতিহাসের মহান সব ব্যক্তিরা রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে অংশগ্রহণ করে নতুন মহাদেশ থেকে অসভ্য, বর্বর পশুদের নিশ্চিহ্ন করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে।

এখনকার মতো তখনো মানুষ মারার উদ্ভাবনী নানা পদ্ধতি নিয়ে মুগ্ধতা ছিল ইউরো-অ্যামেরিকানদের। ধর্ষণ, জীবন্ত পোড়ানো, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারা, আলাদাভাবে টার্গেট করে নারী-শিশু হত্যার পাশাপাশি তাদের খুন করার প্রিয় পদ্ধতি ছিল এক ধরনের প্রাক-আধুনিক জীবাণুযুদ্ধ। 'রেড ইন্ডিয়ান'দের মধ্যে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইউরো-অ্যামেরিকানরা তাদের উপহার দিত গুটিবসন্ত রোগীদের ব্যবহার করা কম্বল। মড়ক লেগে সাফ হয়ে যেত গ্রামের পর গ্রাম, গোত্রের পর গোত্র। ভয়ংকর এ রোগ সম্পর্কে একেবারেই না জানা অধিবাসীদের অনেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত অন্য কোনো এলাকায়, অন্য কোনো গোত্রের কাছে। সাথে নিয়ে যেত গুটিবসন্তের ভাইরাস। চলতে থাকত চেইন রিঅ্যাকশান। আধুনিক অ্যামেরিকান মারণাস্ত্রগুলোর মতোই মানুষ মারায় বিস্ময়কর রকমের কার্যকরী ছিল জীবাণুযুদ্ধের এ কৌশল।[৭]

মানুষ মারার উদ্ভাবনী কৌশল, নির্লিপ্ত পেশাদারি খুন, আর কোনো না কোনো আদর্শের নামে দেয়া অজুহাত–সেই একই প্যাটার্ন। একালের গণহত্যার মতো একই গুণে গুণান্বিত ছিল সেকালের গণহত্যাও।

---

[৬] Thornton, Russell (1990). *American Indian holocaust and survival: a population history since 1492*. University of Oklahoma Press. pp. 26–32

[৭] *Biological Warfare in Eighteenth-Century North America: Beyond Jeffery Amherst*, Elizabeth A. Fenn (2000)

নোয়াম চমস্কি একবার বলেছিলেন,

> *'অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কথা বলা অনেকটা ত্রিভুজের ত্রিভুজাকার হওয়া নিয়ে কথা বলার মতো। আমার জানামতে অ্যামেরিকা হলো একমাত্র দেশ যা প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল সাম্রাজ্য হবার জন্য। জর্জ ওয়াশিংটন অ্যামেরিকাকে বলেছিলেন 'সদ্যোজাত সাম্রাজ্য'। আধুনিক অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ হলো অ্যামেরিকার সূচনালগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা এ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়।'*[৮]

অ্যামেরিকান ঐতিহাসিক জন লুইস গ্যাডিস দেখিয়েছেন ২০০২ এর বুশ ডকট্রিনের সাথে অ্যামেরিকার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন কুইন্সি অ্যাডামসের ১৮১৮ সালের 'সম্প্রসারণেই নিরাপত্তা' (expansion is the path to security) তত্ত্বের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। দুটোর মূল বক্তব্য একই, অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী উদয় হবার আগেই তাকে আক্রমণ করা। আগাম যুদ্ধের (Pre-emptive war) এ দর্শন অনুযায়ী দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ঘরে-বাইরে কাজ করে যাচ্ছে অ্যামেরিকা। আণবিক গণহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া ট্রুম্যান থেকে শুরু করে শুধু ২০১৬-তে মুসলিমবিশ্বে ২৬ হাজারের বেশি বোমা ফেলা[৯] আর ড্রোনহামলার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রেসিডেনশিয়াল 'ক্রসফায়ার' চালানো শান্তিতে নোবেল বিজয়ী শান্তিকামী যুদ্ধাপরাধী বারাক ওবামা পর্যন্ত, মেরিলিন মনরোর প্রেমিক আর ভিয়েতনামের কসাই 'নিপাট ভদ্রলোক' জন এফ কেনেডি থেকে শুরু করে পর্ন অভিনেত্রী আর পতিতাপ্রেমিক গোঁয়ারগোবিন্দ ট্রাম্প পর্যন্ত—একই সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে প্রত্যেক অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট। নাম বদলেছে, মুখ বদলেছে, বদলেছে স্লোগান; কিন্তু বদলায়নি অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ঠান্ডা মাথায় ধ্বংসযজ্ঞের পলিসি।

তিনবার পুলিৎযার জেতা অ্যামেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক, লেখক এবং ইরাক যুদ্ধের উৎসাহী সমর্থক থমাস ফ্রিডম্যানের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে।

> *'বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য হাত অদৃশ্য মুঠি ছাড়া অকেজো। ম্যাকডনেল ম্যাকডগলাসকে ছাড়া ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবসার উন্নতি সম্ভব না।'*

ম্যাকডনেল ম্যাকডগলাস হলো অ্যামেরিকার বিমানবাহিনীর জন্য এফ-১৫ ফাইটার বিমান তৈরি করা কোম্পানির নাম। ফ্রিডম্যানের এ উক্তি খুব সুন্দরভাবে মাত্র দু-

---

[৮] *Modern-Day American Imperialism: Middle East and Beyond*, Noam Chomsky

[৯] America dropped 26,171 bombs in 2016. What a bloody end to Obama's reign, The Guardian, January 9, 2017

লাইনে অ্যামেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। অ্যামেরিকা হলো ওই সাম্রাজ্য, যার স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি তার সামরিক আগ্রাসন আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেকোনো মূল্যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিই প্রথম ও শেষ কথা, বাকি সবকিছু ফুটনোট। অ্যামেরিকার জন্য আরও বেশি বাকি পৃথিবীর জন্য আরও কম।

অ্যামেরিকান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ নথিতে এ কথাগুলো স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে বারবার। যেমন : ১৯৪৮ সালে লেখা অ্যামেরিকার স্টেইট ডিপার্টমেন্টের এক নথির মূল বক্তব্য মোটামুটি এ রকম,

> *'বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেক এখন আমাদের হাতে। যদিও আমাদের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬%। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ অসমতাকে বজায় রাখা... আর তা করার উপায় হলো গণতন্ত্র, আর মানবাধিকারের মতো অস্পষ্ট আদর্শিক বুলির কথা ভুলে গিয়ে বলপ্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার দিকে মনোযোগী হওয়া। বিশ্বজুড়ে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি আর সম্পদের এ তীব্র বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার এটাই একমাত্র উপায়। গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের মতো ধারণাগুলো আম জনতা, রুপালি পর্দা, বক্তৃতার মঞ্চ, আর পেপার-পত্রিকার জন্য। বাস্তব দুনিয়ার পলিসির জন্য না।'*[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অ্যামেরিকার কার্যকলাপের দিকে তাকালে ওপরের কথাগুলোর সত্যতা খুঁজে পেতে কারও সমস্যা হবার কথা না। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি আবোল-তাবোল নিয়ে চিন্তা কখনোই অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। এসব ফাঁকা বুলি, সাম্রাজ্যের একনিষ্ঠ প্রজাদের চোখে ঠুলি পড়ানোই এগুলোর একমাত্র কাজ। এসব 'অস্পষ্ট, আদর্শিক বুলির' বদলে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের নীতি সব সময় নির্ধারিত হয়েছে দুটি মূলনীতি দ্বারা :

ক) অ্যামেরিকা এ পৃথিবীর মালিক। পৃথিবীর যেকোনো কোনায় থাকা যেকোনো কিছুর ওপর তাদের অধিকার আছে।

খ) অ্যামেরিকা যা করে ভালোর জন্যই করে। নৈতিকতা হলো তা-ই যা অ্যামেরিকা করে।

---

[১০] Report by the Policy Planning Staff, Policy Planning Study 23, written by George S. Kennan for the State Department planning staff in 1948, The Office of the Historian.